শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তেলেসমাতি না করাই ভালো

'এ জীবনে শুধু ভাঙা-গড়ার খেলা'। এই গানটা ছোটবেলায় শুনতাম, বাস্তবতার সাথে মেলাতাম। জীবনের পাদপ্রান্তে এসেও সেটার প্রমাণ অনেকবার পেয়েছি। দুর্মুখ বন্ধুমহল কর্মজীবনের প্রথম থেকেই আরেকটা কথা রসিকতা করে বলতো। বলতো ঢাকা শহরের আইল্যান্ড ভাঙা-গড়ার কথা। বলতো, 'প্রথমবার তৈরির সময়ই ঠিকাদার বুঝতে পারেন যে, তিন বছরের মধ্যে আবার ভাঙার প্রয়োজন হবে, তাই সিমেন্ট-বালি কম করে দেন, নিম্ন-মানের ইট ব্যবহার করেন।' এসবই এদেশের হাজার কিসিমের জীবন প্যারোডির অন্যতম। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েও এ দেশে 'ভাঙা-গড়ার খেলার' অন্ত নেই। গত কয়েকদিন আগে আমার এক স্বজাতির লেখা প্রবন্ধ পত্রিকায় পড়েছিলাম। তিনি ভালোভাবেই বুঝিয়েছেন যে, আমরা সৃজনশীল পদ্ধতির নামে যে লেখাপড়া শুরু করেছিলাম, সেটা ভালো ছিল না। যে পদ্ধতি বর্তমানে আমরা ব্যবহার করতে চলেছি তা উত্তম। লেখাপড়ার এখন শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হবে। এসব নিয়ে লেখা পড়লেই আমার ছোটবেলায় পড়া 'দাদির কবর কোথায়, আর আমরা কাঁদছি কোথায়' শব্দগুচ্ছটা মনে পড়ে।

যেদিকে বৃষ্টি সেদিকে আগ-বাড়িয়ে ছাতা ধরার রেওয়াজ আমাদের সামাজিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে অভ্যাসের তো তেমন কোনো পরিবর্তন হবে না। সুতরাং কথা না বাড়ানোই ভালো। আবার কোনো বিভাগ না রেখে এসএসসি পর্যন্ত সাধারণভাবে সবাই একই পড়া পড়ে যাওয়া– এটাও অনেক ভালো বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। বিষয়টাও তর্কের বাইরে নয়। অদূর ভবিষ্যতে এখান থেকে পিছুটান দিলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। কারণ এসএসসির পর দুবছরের কম সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের কোনো নির্দিষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মূলশিক্ষার প্রস্তুতি কতটা সম্ভব হবে এ নিয়ে ভাবনার বিষয় আছে। আবার এ অসুবিধা উত্তোরণের জন্য এসএসসি পর্যায়ে উচ্চতর গণিত, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি দিলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পেরে উঠবে না। এ নিয়ে একটা বিকল্প 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' নামে জাতীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনায় তুলে ধরেছিলাম। একটা বইও প্রকাশ করেছিলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ নেট ঘেটে এখনো বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারেন। সে আলোচনায় আজ যেতে চাইনে। আমি যেমন সৃজনশীল পদ্ধতি তৈরির সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে আশ্চর্য হয়নি, তেমনি ক্লাস ফাইভ ও অষ্টম শ্রেণি পাশ করতে, পাবলিক পরীক্ষার অবতারণা করাতেও আশ্চর্য হয়নি। আশ্চর্য হইনি আবার বন্ধ করাতে। এ সেই 'ভাঙা গড়ার খেলা'র অংশ। আমরা তো যখন যেদিকে ধাই, বাচবিচার না করেই সবেগে ধাই। আবার দলীয় লোকের কথা ও প্রভাব ছাড়া সাধারণ শিক্ষকদের কথা হালে পানি পায় না। দূরে তাকাতাকির অভ্যাস আমাদের কম। যে যেখানে আছি নিজের লাভ-লোকসানকে, রাজনৈতিক আনুগত্যকে বড় করে দেখি। মাঝখান থেকে মাত্র কয়েকটা বছরের ব্যবধানে দুটো পাবলিক পরীক্ষার সমস্ত আয়োজন গুটিয়ে নিতে হলো। অভিভাবকমহল ও সরকারের তহবিল থেকে প্রচুর অর্থকড়ি ব্যয় হলো। অবুঝ শিশু-কিশোরদের মনের সহ্যসীমা পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক-রকমের গবেষণা শেষ হলো। অন্য গবেষণা আবার শুরু হলো। এ গবেষণায় এ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস ও মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে নতুন ছবক শিশু-কিশোরদের মগজে ঢোকাতে মরিয়া হয়ে উঠেছি। এর পরিণতি কি, ভাবার অবকাশ কম। আমাদের রাজনীতি করতে হবে, প্রভুভক্তি করতে হবে, ইজম চাপিয়ে দিতে হবে– এটাই মূল কথা। মুখে এ দেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য একরকম বলি, কাজে উদ্দেশ্যকে অন্যভাবে প্রকাশ পায়, কু-মতলব ধরা পড়ে। এ দেশকে নিয়ে এই কু-মতলব, তা যে পক্ষেরই হোক, বর্জনীয়। এই গবেষণার ভোগান্তি নিয়েই যাদের লেখাপড়া-জীবন শেষ হয়েছে বা হতে চলেছে তাদের কাছে আমাদের কৈফিয়ত কী? আমরা কাজের সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখি। মনের আসল কথাটা প্রকাশ করিনে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মতো 'কর্তা ইচ্ছে কর্ম' করি। এগুলো সবই আমাদের স্বভাব। মাঝখানে পড়ে যারা ভোগার তারা ভোগে।

আমার বুঝ ভিন্ন। শিক্ষা বিষয়ে এসব বুঝের বেশকিছু বেশ কিছুদিন থেকে এ পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশ করছি। একটা প্রবন্ধে অনেক কিছু বলা সম্ভব হয় না। জানিনা এসব কথা সংশ্লিষ্ট পক্ষ আমলে নেয় কি-না।

ব্লুমস ট্যাক্সোনমি একটা শিক্ষণপদ্ধতি। একজন শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা কতটুকু– তা এ পদ্ধতি নির্দেশ করে। যুগ যুগ ধরে এদেশে লেখাপড়ার প্রতিটা পর্যায়ে এটা চালু আছে। এ পদ্ধতির প্রচলন বিশ্বের অনেক দেশেও আছে। পদ্ধতি নিয়ে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে বলে শুনিনি। যত সমস্যা আমাদের দেশে। 'নাচতে না জেনে উঠোন বাঁকা' বলা আর কি! সম্প্রতি 'আউটকাম বেইজড এজুকেশন' নামে আরেকটা পদ্ধতির কথা আমরা জোরেশোরে শুনছি। সেখানে শিক্ষার মাত্রার মৌলিক কোনো পরিবর্তনের বিষয় আমার চোখে পড়েনি। এটাকে 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' বর্ধিত রূপ বলা যায়। এতে 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' প্রায়োগিক দিকের উপর জোর দেয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয়। শিক্ষা দেওয়ার তুলনায় করণিকের কাজ বেড়েছে অনেক বেশি। বিদেশি এসব পদ্ধতিকে একবাক্যে ভালো কিংবা খারাপ বলা উচিত নয়। আমাদের দেশে এসব পদ্ধতির মূলভাবকে নিয়ে সমাজের বুনন, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক পরিবেশ ও মননশীলতাকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশের সৃজনশীল পদ্ধতি নামে খ্যাত বিষয়টাও মূলত কোনো পদ্ধতি নয়। 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' মোট ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে শেষের দুটো পর্যায়ের অর্থাৎ 'শিক্ষার্থীর শেখার ন্যায্যতা প্রতিপাদন (জাস্টিফাই) করতে পারতে হবে' এবং 'শিক্ষার্থীর শেখার একই রকমের নতুন কোনো জিনিস বা ধারণা সৃষ্টি করতে পারতে হবে'– শিক্ষণ-প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমসিকিউ-এর মাধ্যমে মূল্যায়নটাও 'ব্লুমস ট্যাক্সোনমির' দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের একটা শিক্ষণ-মূল্যায়ন। সেটা এদেশে ভালোভাবে প্রয়োগ করতে আমরা নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছি। সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে আমরা ব্যর্থ হলাম বলে অনেকে মুখরোচক কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করছি। আসলে সৃজনশীল পদ্ধতি ও এমসিকিউ পদ্ধতি কোনো শিক্ষণ-পদ্ধতিই নয়– এগুলো শিক্ষণ-মাত্রা ও শিক্ষণ-মূল্যায়ন। একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষার মাত্রা আমাদেরকে মূল্যায়ন করতেই হবে, তা যেভাবেই করি না কেন। আমার দৃষ্টিতে এ দেশে এগুলো কোনো সমস্যাই নয়। এগুলো আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার শামিল। ছাত্রছাত্রী শিখতেই চায় না, আমরা না শিখিয়েই পাশ করিয়ে দিই, ছাত্রছাত্রীদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, শিক্ষার মান রক্ষা করা হয় না, ঠিকমতো শিক্ষা-তদারকি করা হয় না, শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি করেন, ক্লাশে ঠিকমতো পড়ানো হয় না– এসবই মূল সমস্যা। আমরা শিক্ষার্থী নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষাঙ্গণ নিয়ে, শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি (?) করি, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছি– এসবও সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধানে আমরা সহজে ব্রতী হই না, সমস্যা এড়িয়ে যায়। সমস্যার চারপাশে নৃত্য করি, যাকে বলে 'ড্যানচিং এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ক'। এসব সমস্যা সমাধানে আমরা কোনো মেগাপ্রজেক্ট হাতে নিই না। এসব সমস্যার সমাধান আগে জরুরি। নইলে সিলেবাস যতই পরিবর্তন করি, শিক্ষার মান বাড়বে না। তাছাড়া এ দেশের আরেকটা মূল সমস্যা হলো বাস্তবায়ন সমস্যা, যাকে বলি বাস্তবায়নে সিস্টেম লস। অনেক কথাই মুখে বলি, পরিকল্পনা করি, সেমতো কাজ হয় না। এ দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়া দরকার। সৃজনশীল পদ্ধতিই বলি আর ব্লুমস ট্যাক্সোনমিই বলি, কোনোটাই বাস্তবে প্রয়োগ আমরা করিনে বা করতে পারিনে। অথচ এ পদ্ধতি নিয়েই অসংখ্য দেশ শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা কাজ বাদ দিয়ে অনেক বড় কথা বলি।

নতুন বইয়ের বেশ কিছু অংশে আমি মোটামুটি চোখ বুলিয়েছি। শিক্ষা পদ্ধতির তেমন কোনো পরিবর্তন আমার চোখে পড়েনি। আগের মতোই আছে। অনেক দিন থেকেই বলে আসছি আমাদের দেশের পাঠ্যক্রমের অবস্থা অনেক উন্নত দেশের তুলনায় কোনো অংশেই খারাপ না। শিখতে চাইলে এই পাঠ্যক্রম দিয়েই ভালো কিছু শেখা সম্ভব। সমস্যা ঐ এক জায়গায়– বাস্তবায়নে। ছাত্রছাত্রীরা তো পাঠ্যবইয়ের তুলনায় নোটবই বেশি পড়ে। এসবকে আমরা শিক্ষার পরিবেশের সমস্যা বলে গণ্য করতে পারি। আমি বলি, 'সুস্বাদ করে কুল-কাসুন্দি খেতেই যদি চাও, নুনের সাথে একটুখানি মরিচবাটাও দাও'। এ দেশে এই মরিচবাটা দিতেই আমাদের যত আপত্তি। এখানেই আমরা ফেল মারি। এই মরিচবাটার কাজ গিয়ে বর্তাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ওপর, ম্যানেজিং কমিটির ওপর, সরকারের

সংশ্লিষ্ট বিভাগের ওপর। সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থাপনার। অনেকে বলেছেন, শিক্ষকদের অনেকে নাকি সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্রই ভালোমতো তৈরি করতে পারেন না। সেও তো আমাদেরই ব্যর্থতা। আমার প্রশ্ন, এমন শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এলো কীভাবে? এগুলো নিশ্চয়ই রাজনৈতিক স্বজনপ্রীতি, কখনো মানবিচার না করে খরচপাতির বিনিময়ে অতি নিম্নমানের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের সরকারিকরণ, ভালো মেধাবী শিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকর্ষণ না করতে পারাই মূলত দায়ি। এ দায় কে মাথায় নেবে? ভোগান্তি কার? আমাদের ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের দায় তো দেশকে বহন করতে হয়। কাউকে তো জবাবদিহি করতে হয় না, এখানেই সমস্যা।

এ ছাড়া বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে যেটা দেখলাম, সে বিষয়টা বেশ কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যম এবং কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এটা তো শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন নিয়ে নয়, মানসিক বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে জটিল রাজনীতি নিয়ে। বইতে এদেশের ইতিহাসকে কোনো এক গোষ্ঠীর গোলামির নিগড়ে বাঁধার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের এ ভূখণ্ডের ইতিহাস তা বলে না। এক্ষেত্রে আমাদের তখন বলারও কিছু থাকে না। এটা আমাদের হীনমন্যতা এবং জাতিকে গোলামির নিগড়ে আবদ্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সমাজ পরিবর্তনের নামে বিবর্তনবাদের তালিম দেওয়ার চেষ্টা কতটা যৌক্তিক– এটা ভাবার বিষয়। ডারউইনের মতবাদের কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ নেই। নিছক যুক্তি ও অনুমান নির্ভর তত্ত্ব। নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে এ পাঠ দেওয়া অতি আবশ্যক মনে হলে এ তত্ত্বের পক্ষ-বিপক্ষ উভয় দিকই তুলে ধরা যেত। আমার মনে হয়, এটা কোনো ধর্মবিদ্বেষী বাতিল 'ইজম' চাপিয়ে দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা। এটা আমাদের ধর্মবিদ্বেষী 'কর্তাভজা সম্প্রদায়'-এর কাজ। এতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কৃতকর্মের দায় জাতিকে ভোগ করতে হয়। এ দেশে স্বাধীনতার পর থেকেই একটা পক্ষ পূর্ব-ইউরোপের সাথে তাল মিলিয়ে প্রগতিশীলতার মোড়কে আমাদের দেশেও নাস্তিক্যবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ সেদিকে অনেকটা হেলে পড়াতে রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সে ক্ষতির রেশ এখনো দেশকে বইতে হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের মূল তত্ত্ব প্রায় দেশ থেকেই বিদায় নিয়েছে। সে তত্ত্বের পুরোধারা এ দেশে তলে তলে এখনোও নাস্তিক্যবাদী সমাজ চর্চার স্বপ্ন দেখে। পাঠ্যবইয়ের টপিক সিলেকশনে ও বর্ণনায় সে চর্চার প্রতিফলন দেখতে পাই।

শত শত বছর ধরে এদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ গলাগলি করে একত্রে বসবাস করে আসছে। আমাদের অজান্তেই একটা অহিংস সমাজ তৈরি হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ একাকার হয়ে গেছে। এ দেশে সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে খুব একটা পৃথক করা যায় না। ধর্মীয় মূল্যবোধকে উড়িয়ে দিতে চাইলে বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধও উড়ে যাবে। এ দেশে নতুন কোনো ইজমের ক্রমশ প্রয়োগ করে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করার চক্রান্ত জাতির জন্য সুখকর হবে না। এদেশে প্রকৃতপক্ষেই শিক্ষিতসমাজ গড়তে গেলে জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার সাথে শিক্ষায় নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকতেই হবে। প্রগতিশীলতার মোড়কে ইহবাদ, ভোগবাদ কোনো আদর্শ নয় বরং মনুষ্যত্ব তথা মানবিক মূল্যবোধের বিকৃতি। মনুষ্যত্ব থাকা উচিত বলেই আমাদের নাম 'মানুষ' হয়েছে। শিক্ষায় যদি আদর্শহীন এসব 'বাদ'কে জায়গা করে দেওয়া হয়, তাহলে এ দেশের শিক্ষা কোনোদিনই পূর্ণাঙ্গতা পাবে না। এ দেশের জনগোষ্ঠীকে এর খেসারত দিতে হবে। আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

(২৮ জানুয়ারি '২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।